দেশের ৩১টি পণ্য পেয়েছে জিআই স্বীকৃতি

রঙবেরঙ ডেস্ক

বাংলাদেশের রয়েছে নিজস্ব কিছু পণ্য। বিশ্বের অনান্য দেশের মানুষ এসব পণ্য পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে। আমাদের দেশের অজস্র পণ্য থেকে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে অল্প কিছু। জিআই মানে জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন। সহজ করে বললে ভৌগোলিক নির্দেশক হিসেবে নিবন্ধিত। বাংলাদেশে জিআই স্বীকৃতির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)। ২০০৩ সালে অধিদপ্তরটি যাত্রা শুরু করার পর ২০১৩ সালে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন ও ২০১৫ সালে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বিধিমালা প্রণয়ন করে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট ২১টি পণ্য জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন (জিআই) বা ভৌগোলিক নির্দেশক হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে। পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের তথ্যমতে এখন অব্দি ৩১টি বাংলাদেশের পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। জিআই স্বত্ব হলো কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলের কোনো পণ্যকে তাদের নিজস্ব পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। এই পণ্যগুলো বাংলাদেশের নিজস্ব পণ্য হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব বিষয়ক সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস অর্গানাইজেশন'র (ডব্লিউআইপিও) নিয়ম মেনে বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পেটেন্টস, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক বিভাগ (ডিপিডিটি) জিআই স্বীকৃতি ও সনদ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের দশটি জিআই পণ্যের বিশেষত্ব সম্পর্কে জানা যাক।

জামদানি শাড়ি

জামদানি শাড়িকে বাংলাদেশের প্রথম জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর পক্ষ থেকে জামদানিকে জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধনের অনুমোদন চাওয়া হয়। ২০১৬ সালে সেটি স্বীকৃতি পায়। ২০১৩ সালে ইউনেস্কো ঐতিহ্যবাহী জামদানিকে 'ইনট্যানজিবল হেরিটেজ অব বাংলাদেশ' হিসেবে ঘোষণা করেছে। জামদানি বলতে সাধারণত শাড়িকেই বোঝায়। জামদানি শাড়ির প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এটি সম্পূর্ণ হাতে বোনা। জামদানি শাড়ি রেশম ও কার্পাস সুতা দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। ঢাকার নারায়ণগঞ্জ ও সোনারগাঁওয়ে সবচেয়ে বেশি জামদানি তৈরি হয়। একটি জামদানি শাড়ি তৈরি করতে দুই দিন থেকে ৪ মাস বা তার বেশি সময় লাগতে পারে। ঢাকা অঞ্চলে জামদানি তৈরি হচ্ছে প্রায় ৪০০ বছর থেকে। ১৭০০ শতাব্দীতে জামদানি দিয়ে তৈরি নকশাদার শেরওয়ানি, পাগড়ির প্রচলন ছিল। এছাড়া মুঘল আমলে নেপালের আঞ্চলিক পোশাক রাঙ্গার জন্য জামদানি কাপড় ব্যবহৃত হতো। উনিশ শতকের মাঝামাঝি দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, নেপাল ও মুর্শিদাবাদের নবাবরা জামদানির পোশাক পরতেন।

বর্তমানে ঢাকার মিরপুরে জামদানি পল্লি আছে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার নোয়াপাড়া গ্রামে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ২০ একর জমির ওপর জামদানি নগর গড়ে তোলা হয়েছে।

ঢাকাই মসলিন

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ঢাকাই মসলিনকে জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধন করার জন্য ডিপিডিটির কাছে আবেদন করলে সেটি ২০২০ সালে স্বীকৃতি পায়। ঢাকাই মসলিন হচ্ছে ফুটি কার্পাস তুলায় তৈরি এক ধরনের সূক্ষ্ম ও পাতলা কাপড়। শতভাগ সুতি এই কাপড়ের সুতা চরকার মাধ্যমে তৈরি করে গর্ত/পিট তাঁতে বুনন করা হয়। চরকায় কাটা বলে এই কাপড় খুব মসৃণ, পাতলা, স্বচ্ছ, ওজনে হালকা এবং পরিধানে বেশ আরামদায়ক। ভালো মানের ফুটি কার্পাস মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে ঢাকা জেলার আশেপাশে সোনারগাঁ, ধামরাই, কাপাসিয়া, কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি, বাজিতপুরসহ কয়েকটি স্থানে জন্মায়। গাজীপুরের কাপাসিয়া নামটি এই কার্পাস থেকেই এসেছে বলে মনে করা হয়। মসলিনের ইতিহাস হাজার বছরের। মসলিন শব্দটি ইরাকের প্রাচীন ব্যবসাকেন্দ্র মসুল থেকে উদ্ভূত বলে ধারণা করা হয়। এই কাপড়ের উৎপাদন ১৭ শতকে মোঘল আমলে ব্যাপক বিকাশ লাভ করে।

রাজশাহী সিল্ক

'রাজশাহী সিল্ক' পণ্যটিকে জিআই হিসেবে নিবন্ধনের জন্য ২০১৭ সালে আবেদন করে রাজশাহী জেলার বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড। যা ২০২১ সালে স্বীকৃতি পেয়েছে। রেশম কাপড়ের একটি ব্র্যান্ডের নাম রাজশাহী সিল্ক। এর মূল বৈশিষ্ট্য হলো এটি মালবেরি সিল্ক ও প্রোটিনাস ফাইবার দিয়ে তৈরি। মালবেরি হলো তুঁত গাছ। এই গাছের পাতা রেশম পোকা ২০-২২ দিন খাওয়ার পর পোকার মুখ থেকে লালা নিঃসৃত হয়। সেই লালা থেকে তৈরি হয় রেশম গুটি। এই রেশম গুটি থেকে রিলিং মেশিনের মাধ্যমে সুতা বা কাঁচা রেশম উত্তোলন করা হয়। সেই কাঁচা রেশমকে বিভিন্ন উপায়ে প্রক্রিয়া করে তাঁত মেশিনে বুনে তৈরি করা হয় রাজশাহী সিল্কের কাপড়। কাপড় বোনার পর বিভিন্ন রঙ দিয়ে ডাই ও প্রিন্ট করা হয়। অনেক সময় কাপড় বোনার আগে সুতা রঙ করা হয়ে থাকে। এ কারণে রাজশাহী সিল্ক দেখতে বেশ উজ্জ্বল ও চকচকে। সেইসঙ্গে কোমল ও আরামদায়ক। স্বাভাবিক অবস্থায় রাজশাহী সিল্কে ১১% জলীয় অংশ থাকে। এ কারণে শীত, গ্রীষ্ম সব ঋতুতে রাজশাহী সিল্ক পরিধান করা আরামদায়ক। রাজশাহীর বোয়ালিয়া এলাকায় এই রেশমের চাষ হতো সবচেয়ে বেশি। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রাজশাহী সিল্ক রপ্তানি হতো। এখন নতুন করে রপ্তানি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ধারণা করা হয় ১৭৫৯ সাল বা তার আগে থেকেই রাজশাহীতে রেশম পোকার উৎপাদন ও এর কাপড় ব্যবহার হয়ে আসছে।

রংপুরের শতরঞ্জি

রংপুরের ঘাঘট নদীর তীরে নিসবেতগঞ্জ গ্রামে শতরঞ্জি শিল্প গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ নাগরিক নিসবেট ১৮৪০ শতাব্দীর দিকে তৎকালীন রংপুর জেলার কালেক্টর ছিলেন। সেই সময়ে নিসবেতগঞ্জের নাম ছিল পীরপুর। পীরপুর গ্রামে সে সময়ে নানা রঙের সুতার গালিচা বা শতরঞ্জি তৈরি হতো। নিসবেট এসব শতরঞ্জি দেখে এ শিল্পের প্রচার ও প্রসারে সহায়তা দেন এবং বিপণনের ব্যবস্থা করেন। এই ভূমিকার জন্যই নিসবেটের নামানুসারে পীরপুরের নামকরণ হয় নিসবেতগঞ্জ। মোঘল সম্রাট আকবরের দরবারে শতরঞ্জি ব্যবহার করা হতো বলে জানা যায়। সে সময়ে শতরঞ্জি রাজা-বাদশাহ, বিত্তবানদের বাড়িতে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো। ব্রিটিশ শাসনামলে শতরঞ্জি এতো বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে যে এখানকার তৈরি শতরঞ্জি সমগ্র ভারতবর্ষ, বার্মা, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো। শতরঞ্জি তৈরির জন্য কোনো যন্ত্র লাগে না। বাঁশ এবং রশি দিয়ে মাটির উপর সুতা টানা দিয়ে হাতে নকশা করে শতরঞ্জি তৈরি করা হয়। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) ২০১৯ সালে আবেদন করেছিল। যা ২০২১ সালে এসে স্বীকৃতি পায়।

নকশি কাঁথা

নকশি কাঁথা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী একটি লোকশিল্প। নকশি কাঁথা হলো সাধারণ কাঁথার উপর নানা ধরনের নকশা করে বানানো বিশেষ প্রকারের কাঁথা। প্রধানত সুতির কাপড়, সূঁচ ও রঙিন সুতা দিয়ে এটি তৈরি করা হয়। সাধারণত পুরাতন কাপড়ের পাড় থেকে সুতা তুলে আবার নীল, লাল, হলুদ প্রভৃতি সুতা কিনে এনে কাপড় সেলাই করা হয়। ঘরের মেঝেতে পা ফেলে পায়ের আঙ্গুলের সঙ্গে কাপড়ের পাড় আটকিয়ে সুতা খোলা হয়। এই সুতা পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য রেখে দেওয়া হয়। সাধারণ কাঁথা সেলাইয়ের পর এর উপর মনের মাধুরী মিশিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় বিভিন্ন নকশা। যার মধ্যে থাকে ফুল, লতা, পাতা ইত্যাদি। সাধারণত পুরানো কাপড়, শাড়ি, লুঙ্গি ও ধুতি দিয়ে কাঁথা তৈরি হয়। সাধারণ কাঁথা বছরের সব সময়ই ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু নকশিকাঁথা বিশেষ উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত হয় এবং তা পুরুষানুক্রমে স্মারকচিহ্ন হিসেবে সংরক্ষিত থাকে। নকশিকাঁথা সেলাইয়ের কোনো নির্দিষ্ট নকশা নেই। মাঝারি আকারের কাঁথা তৈরিতে ৭ থেকে ১৫ দিন লেগে যায়। বড় কাঁথা এবং জটিল নকশা করতে এক মাসেরও বেশি সময় লাগতে পারে। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কমবেশি নকশিকাঁথা তৈরি হলেও নকশিকাঁথার বিবরণ দিতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা মূলত তিনটি অঞ্চলকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো ফরিদপুর-যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল, রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চল এবং জামালপুর-ময়মনসিংহ অঞ্চল। এই তিনটি অঞ্চলের নকশিকাঁথারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যশোর-কুষ্টিয়ার কাঁথা নকশার নিরিখে সর্বোৎকৃষ্ট। চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের কাঁথা সবচেয়ে পুরু যার মধ্যে আছে লহরী কাঁথা। জামালপুর-ময়মনসিংহ থেকে আসে আরেক ধরনের কাঁথা-যার মধ্যে সূক্ষ্ম ফোঁড়ের কাজ করা পাড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জামালপুর জেলা প্রশাসন আবেদন করার পর ২০১৯ সালে জিআই পণ্য হিসেবে নকশি কাঁথা স্বীকৃতি লাভ করে।

জিআই স্বীকৃতি পাওয়া ৩১টি পণ্য

০১. জামদানি শাড়ি ০২. বাংলাদেশের ইলিশ ০৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম ০৪. বিজয়পুরের সাদা মাটি ০৫. দিনাজপুর কাটারিভোগ ০৬. বাংলাদেশের কালিজিরা ০৭. রংপুরের শতরঞ্জি ০৮. রাজশাহী সিল্ক ০৯. ঢাকাই মসলিন ১০. রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলি আম ১১. বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি ১২. বাংলাদেশের শীতল পাটি ১৩. বগুড়ার দই ১৪. শেরপুরের তুলশীমালা ধান ১৫. চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম ১৬. চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম ১৭. নাটোরের কাঁচাগোল্লা ১৮. বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ১৯. টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম ২০. কুমিল্লার রসমালাই ২১. কুষ্টিয়ার তিলের খাজা ২২. রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আম ২৩. মৌলভীবাজারের আগর ২৪. মৌলভীবাজারের আগর আতর ২৫. মুক্তাগাছার মণ্ডা ২৬. যশোরের খেজুরের গুড় ২৭. নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা ২৮. রাজশাহীর মিষ্টি পান ২৯. গোপালগঞ্জের রসগোল্লা ৩০. জামালপুরের নকশিকাঁথা ৩১. টাঙ্গাইল শাড়ি।